*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 03*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 16 - 26*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**
*Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 16 - 26*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848*

# মধ্যযুগ ও বাংলা সাহিত্য : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্বরূপসন্ধান

ড. কাজল গাঙ্গুলী
সহকারী অধ্যাপক
চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়
Email ID : ganguli111kajal@gmail.com

***Received Date*** *25. 06. 2025*
***Selection Date*** *20. 07. 2025*

***Keyword***
*Literature, Dark Age, Mithila Dynasty, Vidyapati, Chaitanyadev, Kheturi Festival, Chitrachampu, Maharashtra Purana, Gopal Bhand.*

***Abstract***
*Literature is life-based. History is created at the pace of ongoing life. Literature and history in the same body—the combination of these two forms is the history of literature. The perspective of some important events of the Middle Ages and their inevitable manifestation in literature— the nature of the coexistence of these two is the essence of this article. The reason for the bitterness of the dark age is not only the Turks, but also the arrogance of the intelligent Brahmins, their bias towards Sanskrit and their aversion to Bengali. When the Bengalis devastated by the Turkish invasion in Bengal were making a feeble attempt to breathe in the Bengali language, the scholar Vidyapati's verses written in Brajbuli established a connection between Bangla and Mithila. The writers of Chaitanya's life have presented contradictory information about death of Chaitanya. The search for new elements of history and the inquisitive minds of later times may give rise to some other new views. Until then, it is very important for us to rise above religious sentiments and reach the conclusion that even the incarnation dies. The movement of Gaurachandrika and Palakirtan, introduced by Kheturi, began to grow from the 16th century. At that time, a compiled Pala book was needed. As a result, several collections of Padavali were found in the 17th, 18th and 19th centuries. These collections of Padavali are a special treasure of medieval Bengali literature. The period of the Bargi uprising in Bangladesh is from 1742 to 1749 AD. The atrocities of the Bargis led by Bhaskar Pandit were a disaster for the public mind of Bangladesh. The story of the cruel atrocities of the Bargis is narrated in two poems of that time. One is Chitrachampu by Pandit Baneshwar Vidyalanka and the other is a Maharashtrapuran by Gangaram Sen. The stories of Gopal Bhand, passed down orally to satisfy the original and genuine interest in listening to stories, are a different experience, as well as evidence of the inner currents of the minds of people in the eighteenth century.*

## Discussion

সাহিত্য জীবন নির্ভর। চলমান জীবনের পায়ে পায়ে ইতিহাসের সৃষ্টি। একই অঙ্গে সাহিত্য আর ইতিহাস— এই দুই রূপের সংমিশ্রণই সাহিত্যের ইতিহাস। যেন চাঁদের গায়ে চাঁদ। ইতিহাসের কলঙ্ক সাহিত্যের কাছে অযাচিত দান আর ইতিহাসের গৌরব, সাহিত্যে তার পূর্ণদীপ্তিময় চন্দ্রকলার প্রকাশ। মধ্যযুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিত ও সাহিত্যে তার অনিবার্য প্রকাশ— এই দুইয়ের সহাবস্থানের স্বরূপ অনুধ্যানেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

**১। অন্ধকার যুগ কিংবা খিচুড়ি ভোজের ইতিহাস** [১] - ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে (১২০২ খ্রিষ্টাব্দ) অতর্কিত তুর্কি আক্রমণে বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ ত্যাগ করে সপরিবারে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। বাংলার শূন্য আসন দখল করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কি নেতা ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খিলজী। নদিয়ায় সেনরাজাদের অধিকার লুপ্ত হয়। বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে হিন্দুর কর্তৃত্ব বিনষ্ট হল।

> “সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা।”[২]

— বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক নিষ্ঠা নিয়ে বাঙালির কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর যুক্তি ছিল এই—

> “সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল।”[৩]

যদিও বাঙালির এই গৌরব ক্ষণিকের। কারণ নবদ্বীপ অধিকার করে অচিরেই বখতিয়ার রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করেন। বঙ্গদেশের পতন ও লক্ষণ সেনের পলায়নবৃত্তির মনোভাবে ঐতিহাসিকের চোখে বাঙালি আজও ‘কাপুরুষ ও ভীরু’ অভিধায় বিভূষিত।

তুর্কি আক্রমণের প্রথম দেড়শ বছর (১২০২—১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ, ইলিয়াস শাহীর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত) বাংলার সমাজ অভ্যন্তরে এক রূপান্তর প্রতিনিয়ত চলছিল। এই রূপান্তর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মসাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তুর্কিরা বাংলাদেশে বৌদ্ধবিহার ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রগুলি বিনষ্ট করে। বাঙালির চৈতন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে এই মানসিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা বা সাহিত্যসৃষ্টি কোনোটাই সম্ভব হয়নি।

> “প্রজাসাধারণের জীবনেও উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ধর্মহানির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর উৎকট হয়ে উঠেছে। ... স্বভাবতই জীবনের এই বিপর্যয়লগ্নে কোন সৃজন-কর্ম সম্ভব হয়নি।”[৪]

ফলে এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শনও পাওয়া যায়নি। এই সময়কালই বাংলা সাহিত্যের সংশয়াচ্ছন্ন অনুর্বর পর্ব বা অন্ধকার যুগ।

তামস যুগের উক্ত দেড়শ বছরের সামাজিক পরিমণ্ডল বাঙালির সাহিত্য সৃষ্টির পথে ছিল প্রধান অন্তরায়— এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পূর্বে একবার মনোনিবেশ করা যেতে পারে, তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে সত্যিই কি বাঙালির নিজের ভাষায় সাহিত্য রচনার সদিচ্ছা ছিল? সে যুগে যে সংস্কৃতচর্চার একটি ক্ষীণধারা অক্ষুণ্ণ ছিল, অভিধান – স্মৃতি – পুরাণ – ধর্মপুস্তিকা - সদুক্তি কর্ণামৃত-গাথাসপ্তসতী প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত খণ্ডকবিতা সংকলনগুলিই তার প্রমাণ। বাঙালির কবিপ্রতিভা ও বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্পর্কচ্যুত ছিল। সুতরাং তুর্কি আক্রমণে বাংলা সাহিত্য নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

> “মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রায় সকল দেশের সকল বিজেতারাই ধর্মোন্মাদ ছিল। মুসলমান যে দেশেই রাজত্ব করেছে সেখানকার অধিবাসীরাই অনতিবিলম্বে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। অথচ, পাঁচশত বৎসর ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাট ও রাজারা রাজত্ব করলেন তথাপি হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম নিশ্চিহ্ন হওয়া তো দূরের কথা, ভারত ভূমিতে শতকরা ত্রিশটি মানুষও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল না — ইতিহাসে এ একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম।”[৫]

— এই ব্যতিক্রমী ঘটনাই প্রমাণ করে যে ধর্মপ্রচারে তাঁদের চেষ্টা সর্বাত্মক ছিল না। কারণ দেড়শ বছরের নিরবচ্ছিন্ন ধর্মীয় আঘাতে বাংলাদেশে একজনও হিন্দু ধর্মাবলম্বী থাকত কিনা সন্দেহ থেকেই যায়।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 16 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসলে তুর্কি আক্রমণের পূর্বে বাংলায় ধর্মনৈতিক সঙ্কট ছিল প্রকট। সেন আমল থেকেই সমাজে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রাধান্য ছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশের অন্ত্যজ অনার্য সংস্কারে সহজিয়া এবং তন্ত্র ও মহাযানী বৌদ্ধরা ছিলেন জনসাধারণের অত্যন্ত কাছের। অর্থাৎ -

> "বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্যশক্তি— এক বা উভয়ের নেতৃত্ব এরা (সাধারণ মানুষ) মেনে এসেছিল। ধীরে ধীরে দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এরা হয়তো ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিতে পরিণত হত।"[৬]

সামাজিক 'দ্বন্দ্ব সমন্বয়'-এর মধ্যে তৎকালীন সমাজে সমন্বয়ের চেয়ে দ্বন্দ্বের ভাবটিই ছিল প্রকট। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রাজশক্তি ও রাজধর্মের (অবশ্যই হিন্দুধর্ম) বিরুদ্ধে ছিল তীব্র বিদ্বেষ। অন্যদিকে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য শক্তির দ্বারাই বৌদ্ধগণ অনেক বেশি নিপীড়িত হয়েছেন। এই যুগের একটি লিপিতেও এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কোনো ব্যক্তি বা কোনো বৌদ্ধবিহার বা সংঘ কোনপ্রকার রাজানুগ্রহ লাভ করছেন। 'শূন্যপুরাণে'-র অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'-এর সপক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য বয়ান -

"এইরূপে দ্বিজগন        করে সৃষ্টি সংহরন
এ বড় হইল অবিচার
...
অন্তরে জানিয়া মর্ম        বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম
মায়ারূপী হইল খন্দকার।
হইয়া যবনরূপী        শিরে পরে কালটুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
...
দেউল দোহারা ভঙ্গে        কাড়্যা কিড়া খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।।"[৭]

অনুমান, চতুর্দশ শতকে উড়িষ্যার কোনারক নগর ধ্বংসের বিবরণ। বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে নিরঞ্জন রুষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে দেবতাদের যুদ্ধে নিয়োজিত করলেন। দেবতারা এলেন যবন রূপে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আদম, গনেশ, কার্তিক, নারদ, পুরন্দর যবনরূপে হলেন মহামদ, পেগাম্বর, কাজী, গাজী, শেখ, মৌলানা। অর্থাৎ 'বিজয়ী তুর্ক যখন হিন্দুর দেব-দেউল ভাঙছে তখন বৌদ্ধ কবি(?) রামাঞি পণ্ডিত তাতে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন না, বরং ন্যায়েরই বিধান দেখছেন।'[৮] দেশের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ কাজিয়া চোরাস্রোতের মতো বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তুর্কি আক্রমণের ঘটনাকে শিখণ্ডী মেনে 'নন্দঘোষের' ভূমিকায় মুসলমানকে বিদ্ধ করে বাঙালির 'যতদোষ' আড়াল করার প্রচেষ্টা আত্মপ্রসাদ লাভ ছাড়া আর কিছু নয়।

একথা ঠিক, মহম্মদ বিন বখতিয়ার মন্দির-বিগ্রহ বিধ্বস্ত করে সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন, নতুন মসজিদ। মাদ্রাসা ও ইসলামিক শিক্ষার মহাবিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করে, বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করে, তিনি তাঁর ধর্মীয় উৎসাহ চরিতার্থ করেন। অর্থাৎ ধ্বংসের পাশাপাশি নির্মাণও চলছিল একই সঙ্গে। মাদ্রাসা ও ইসলাম শিক্ষার প্রসার ও প্রচার স্বার্থে একটি নতুন উপাদান যুক্ত হয়— আরবি বা ফার্সি ভাষা। সমাজের ভাষাবিন্যাস দাঁড়ায় ত্রিস্তরমুখী -

১। সংস্কৃতশাস্ত্রসম্পন্ন (ব্রাহ্মণ্যপন্থী বা বৌদ্ধতান্ত্রিক) ব্যক্তিদের সংস্কৃত ভাষা
২। অন্ত্যজ, অনার্য (অবৈদিক, বৌদ্ধ, অস্মার্ত, অব্রাহ্মণ)-দের বাংলা ভাষা
৩। ইসলাম-ধর্ম প্রচারের জন্য গাজী ও পীরদের আরবি-ফার্সি ভাষা

মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন সাহিত্য রচয়িতাদের অবহেলায় বাংলা ভাষা আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। সংস্কৃত ভাষার লালন ও সমৃদ্ধিতেই তাঁরা মনোনিবেশ করেছিলেন বেশি। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের ছিল অবজ্ঞা। দশম শতাব্দীর চর্যাপদগুলি ছিল বাংলা ভাষার শিবরাত্রির সলতে স্বরূপ। বরং সংস্কৃত ভাষার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান শাসকদের মধ্যে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নেবার কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায়নি।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 16 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এলে তাঁরা বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিলেন এবং পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন।

> "আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ... গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ।"[৯]

সুতরাং তমসাচ্ছন্ন যুগের তামসিকতার কারণ একমাত্র তুর্কিরা-ই নয়, স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যবর্গের ঔদ্ধত্য, সংস্কৃত ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও বাংলাভাষার প্রতি অনীহাও বহুলাংশে দায়ী। এবং বাঙালির জাতি হিসেবে বিপর্যয়ের ইন্ধন অন্নরূপী বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'খিচুড়ি'-ই যে জোগাবে, এতে আর সন্দেহ কী!

**২। মিথিলার রাজবংশ : বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক -**

মিথিলা রাজসভায় বিদ্যাপতির প্রবেশকাল বিতর্কের বিষয়। তাঁর দীর্ঘজীবনে (১৩৮০ – ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দ) একাধিক রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, প্রমাণ আছে। বিদ্যাপতির রাজনামাঙ্কিত পদগুলিতে ভোগীশ্বর, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ ও বীরসিংহ প্রমুখ কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়।

১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের হাতে মিথিলার শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি কর্ণাট ক্ষত্রিয় ন্যান্যদেব-বংশীয় হরিসিংহদেব পরাভূত ও পলায়িত হলে সামন্ত নৃপতিরূপে সিংহাসনে বসেন ব্রাহ্মণ কামেশ্বর। ১৩৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান ইলিয়াস শাহ ত্রিসৃত জয় করে মিথিলাকে গৌড়ের সামন্তরাজ্যে পরিণত করেন। কিন্তু ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শাহ পুনরায় মিথিলা অধিকার করেন এবং কামেশ্বরকে সরিয়ে তাঁর পুত্র ভোগীশ্বরকে সিংহাসনে বসান। ভোগীশ্বরের পর গণেশ্বর বা গএণেস রাজ্যলাভ করেন। আনুমানিক ১৩৭২ খ্রিষ্টাব্দে আসলান নামের এক মুসলমান সামন্তের হাতে তিনি নিহত হন। মিথিলা কিছুকালের জন্য মুসলমান শাসনাধীন হয়। এরপর গএণেসের পুত্র কীর্তিসিংহ আসলানকে পরাজিত করে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ও সামন্ত-নৃপতি রূপে সিংহাসনে বসেন। কীর্তিসিংহের পর তাঁর জ্ঞাতি খুড়া দেবসিংহ মিথিলার রাজা হন এবং তাঁর পুত্র শিবসিংহ রূপনারায়ণ পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। শিবসিংহের পর যথাক্রমে পদ্মসিংহ, নরসিংহ, ভৈরবসিংহ মিথিলার কামেশ্বর রাজবংশের উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে বসেন।

কুলপঞ্জী অনুসারে বিদ্যাপতি যে ঠক্কুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে বংশের অনেকেই সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান রাজকর্মচারী রূপে মিথিলার রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে দেবাদিত্য, বীরেশ্বর, গণেশ্বর, জটেশ্বর, ধীরেশ্বর, জয়দত্ত, গণপতি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বংশ পরম্পরায় মিথিলা রাজসভার সঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং মিথিলা রাজদরবারের সঙ্গে বিদ্যাপতির যোগাযোগ অতর্কিতে নয়, সুদীর্ঘ ইতিহাস পরম্পরায় তার যোগসূত্র নিহিত। বিদ্যাপতি কেবল পদকর্তা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সে যুগের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও স্মার্ত মনীষী। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে রাজানুকূল্যে যে গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন, সেগুলি –

১। কীর্তিসিংহের রাজত্বকালে, কীর্তিলতা, অবহট্টভাষায় কীর্তিসিংহের কীর্তিকাহিনী।

২। দেবসিংহের বদান্যতায়, ভূপরিক্রমা, সংস্কৃত ভাষায় মিথিলা থেকে প্রয়াগ কাশী পর্যন্ত পথ বিবরণ।

৩। শিবসিংহের পৃষ্ঠপোষণায়, পুরুষ পরীক্ষা, সংস্কৃত ভাষায় শিবসিংহের বীরত্বকাহিনী ও সংস্কৃত ভাষায় আরও দুই শতাধিক পদ ও কাহিনী।

৪। পুরাদিত্যের আশ্রয়ে, লিখনাবলী, সংস্কৃতে রচিত আদর্শ পত্রলিপি।

৫। পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবীর আনুকূল্যে, শৈবসর্বস্বহার ও গঙ্গাবাক্যাবলী, স্মৃতিগ্রন্থ।

৬। নরসিংহ ও ধীরমতীর অনুজ্ঞায়, বিভাগসার ও দানবাক্যাবলী, পাণ্ডিত্য-বিচারসম্বলিত স্মৃতিগ্রন্থ ধীরসিংহ ও ভৈরবসিংহের নির্দেশে, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী, স্মৃতিগ্রন্থ।

কীর্তিসিংহের রাজসভায় 'কীর্তিলতা' রচনাকালে তিনি নিজেকে 'খেলনকবি' বলে পরিচয় দেন। কীর্তিসিংহের কীর্তিস্তুতি প্রসঙ্গে সমগ্র কাব্যটিতে বীররসের উদ্দীপনা প্রকাশিত। সভাকবির প্রশস্তিকাব্য 'কীর্তিলতা'তে সৌন্দর্যচর্চার যে দিকটি উপেক্ষিত, শিবসিংহের রাজসভায় লিখিত রচনাগুলিতে তা সর্বতোভাবে বর্তমান।

মিথিলারাজ শিবসিংহের সুহৃদ ছিলেন বিদ্যাপতি। শিবসিংহ তাঁর কবিত্বশক্তিতে প্রীত হয়ে তাঁকে 'অভিনব জয়দেব', 'মহারাজ পণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত করেন। বিদ্যাপতিও তাঁর রচনায় শিবসিংহকে 'মদন', 'অভিনবকৃষ্ণ', 'শিবঅবতার', 'বিষ্ণু অবতার' মেনে সম্মান জানিয়েছেন। তাঁর লেখা শিবসিংহ নামাঙ্কিত পদের সংখ্যা প্রায় দুশো। পদ্মসিংহের নির্দেশে বিদ্যাপতি লেখেন 'শৈবসর্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী'। রাজা নরসিংহের আদেশে 'ব্যড়িভক্তিতরঙ্গিনী বা মনসাপূজা প্রকরণ' ও 'বিভাগসার বা সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়', রাণী ধীরমতী দেবীর নির্দেশে 'দানবাক্যাবলী বা দাননীতি' লেখেন। এছাড়া রাজা ধীরসিংহ ও যুবরাজ ভৈরব সিংহের আজ্ঞায় লেখেন 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'।

বিদ্যাপতির প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। তাঁর রচনাপঞ্জীর বিষয় বৈচিত্র্যের বিস্ময়কর অবতারণাই তার প্রমাণ। ভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিচিত্রকর্মা। মাতৃভাষা মৈথিল ছাড়া আরও তিনটি ভাষায় (সংস্কৃত, অবহট্ট, কৃত্রিম ব্রজবুলি) গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিদ্যাপতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ ব্রজবুলিতে রচিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক পদগুলির মাধ্যমে। ব্রজবুলি কোনোকালে কোনো জনগোষ্ঠীরই কথ্য বা লেখ্যভাষা ছিল না। বাংলা-মৈথিল-অবহট্ঠাদি মিশ্রিত এই কৃত্রিম কাব্যভাষার মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা উৎকৃষ্ট গীতিরূপ লাভ করেছে। তদানীন্তন মিথিলা দীর্ঘকাল ধরে বাংলার সারস্বত তীর্থ ছিল, ফলে বাংলার সঙ্গে মিথিলার সংস্কৃতির আদান প্রদানের একটি প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় বিদ্যাপতির পদগুলি। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসমাজে বিদ্যাপতির বিস্তার ও গোবিন্দদাশের পদগুলিতে ব্রজবুলির অনুরণনেই প্রমাণিত 'বিদ্যাপতি বাংলাসহিত্যের অভিনব জয়দেব' অভিধাটি যথার্থ।

বাংলায় তুর্কি আক্রমণে বিধ্বস্ত বাঙালি যখন বাংলা ভাষায় শ্বাসগ্রহণ করার ক্ষীণ চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন মিথিলায় বিপর্যস্ত সমাজজীবনকে পুর্নবিন্যস্ত করার দায়িত্বে ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যাপতি। ফলে ব্রজবুলি ভাষার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলির আস্বাদন বাঙালিকে অতিরিক্ত প্রাণবায়ু জোগান দিয়েছিল। একদিকে সংস্কৃতে লেখা জয়দেবের গীতগোবিন্দ অন্যদিকে বিদ্যাপতির ব্রজবুলিতে লেখা পদাবলীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিল বাঙালির মন ও মনন। এবং এই সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ায়, নেপথ্যে মিথিলার সিংহ রাজদরবারের ভূমিকা ছিল সদর্থক ও সদাজাগ্রত। এ বিষয়ে মিথিলার কামেশ্বর রাজবংশকে বাংলা সাহিত্যের নেপথ্যের কারিগর হিসেবে চিহ্নিত করলে, নিশ্চয় অত্যুক্তি হয় না।

**৩। পরিব্রাজক চৈতন্যদেব : পথের শেষ কোথায় -**

চৈতন্যদেবের জীবন মানে এক পরিব্রাজকের জীবন। ক্লান্তিহীন তাঁর এই পথচলা। ড. সুকুমার সেনের 'চৈতন্যাবদান'-এ বর্ণিত 'চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনকথা' অনুসরণে চৈতন্যের পথপরিক্রমার একটি সংক্ষিপ্ত লেখ্য মানচিত্র তৈরী করা যেতে পারে -

> জন্ম থেকে প্রথম চব্বিশ বছর: নবদ্বীপ → পূর্ববঙ্গ (সম্ভবত সিলেট) → নবদ্বীপ → গঙ্গাতীর পথে কহলগাঁ → ভাগলপুর-মন্দার-বৈদ্যনাথধাম পথে সশিষ্য গয়াগমন (পিতৃকৃত্য প্রয়োজনে, ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষালাভ, সন্ন্যাস গ্রহণ)।
>
> সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী ছয় বছর : নবদ্বীপ → কাটোয়া (কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা) → রাঢ়দেশ (উত্তর বর্ধমান, দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূম ও সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের অংশ) → শান্তিপুর → পুরী → দক্ষিণভারত (রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, মালাবার, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র) → পুরী → গৌড় → কাশী (উড়িষ্যা ও ছোটোনাগপুরের বনপথে) → চৈতন্য প্রয়াগ → মথুরা → বৃন্দাবন → কাশী। জীবনের শেষ আঠারো বছর : আমৃত্যু নীলাচলে বাস।

এই সুদীর্ঘ পর্যটনের ফলে তৎকালীন ভারতবর্ষের বিরাট ও বিচিত্র জীবনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের পরিচয় ঘটে। তাঁর জীবন ও প্রেমধর্ম যখন সমস্ত বাঙালি জীবনকে প্রেরণাদান করে তখন সেই বাঙালিও ভারতের প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে নিজের যোগসূত্র স্থাপন করল। বাঙালির দৃষ্টি প্রাদেশিকতার সীমা ছাড়িয়ে জীবনের বিশালতার আস্বাদ পেল। উপরের লেখ্য মানচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনি পুরী বা নীলাচলকেই কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করে একাধিকবার ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছেন। তাঁর নীলাচলে অবস্থানের সিদ্ধান্তের পিছনে যে কারণগুলি ছিল -

১। বাংলা থেকে যাতায়াত সহজসাধ্য, ভক্তগণের সঙ্গে যোগাযোগ অনায়াসে রক্ষিত।

২। মুসলমান শাসনের বাইরে, সেখানে হিন্দুধর্ম অনেকটাই সুরক্ষিত, ধর্মাচরণের অবাধ স্বাধীনতা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 16 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সর্বভারতীয় যোগাযোগ স্থাপন সহজসাধ্য।

৪। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব থেকেই পুরী বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল। সেখানে সমাজে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা সহজলভ্য।

৫। জনগণের আরাধ্য দেবতা জগন্নাথের অবস্থান পুরীতে। জগন্নাথের অনুগ্রহে ভিক্ষারও অনটন নেই। সুতরাং চৈতন্যের পক্ষে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কেন্দ্রস্থলরূপে পুরীকে মনোনীত করা স্বাভাবিক।

জীবনের শেষ আঠারো বছর চৈতন্যদেব পুরী ছেড়ে আর কোথাও যাননি। আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে। কিন্তু কোথায় এবং কীভাবে এই পরিব্রাজকের মৃত্যু হল, সে সম্পর্কে চৈতন্য জীবনীকারেরা আশ্চর্য রকমভাবে নীরব। পুরীতে কৃষ্ণভ্রমে সমুদ্রের নীল জলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন — এই হল সুপ্রচলিত কাহিনী। লোচনদাসের কাব্যে 'জগন্নাথ দেহে লীন' হবার কথা আছে। একমাত্র 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে জয়ানন্দ এ বিষয়ে কিছুটা সরব -

"আষাঢ় পঞ্চমী রথ বিজয় নাচিতে
ইটাল বাজিল বাম পা এ আচম্বিতে।
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে।
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পারিষদ সঙ্গে
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে।
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে।"

চৈতন্যদেবের মতো এক যুগাবতারের তিরোভাব বিষয়ে জয়ানন্দের এই ক্ষুদ্র বিবৃতিকে ইতিহাস রচয়িতারা যথেষ্ট আমল দেননি। তাঁর সমগ্র কাব্যে বিভিন্ন স্থানে ইতিহাসের তথ্যভ্রান্তি, ক্রমভঙ্গ দোষের কারণে তাঁর এই মত গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

> "এই বর্ণনায় খানিকটা সত্য থাকা সম্ভব। কিন্তু সবটা নয়। কেননা রথবিজয় নৃত্যের পরের দিন অদ্বৈত বা কোনো ভক্ত নীলাচল ছাড়িয়া আসিবেন বলিয়া মনে হয় না।"[১০]
>
> "...প্রামাণ্য জীবনীকার রূপে গৃহীত হবেন না। তাঁর বইয়ে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ থেকে গৃহীত তথ্যের সঙ্গে জনশ্রুতিমূলক নানা আধা-সত্য মিশেছে।"[১১]

আসল কথা, -

> "বহুপূর্বেই 'মহাপ্রভু' অবতার বলে ভক্তসমাজে গৃহীত হয়েছেন। সেকালে কেন, এখনও যে, এদেশ অবতারের দেশ। কাজেই তাঁর মৃত্যুর কথা আর ভক্ত সমাজ আলোচনাই করেন না, তা তাঁর দেবলীলার চূড়ান্ত রহস্য।"[১২]

প্রায় পাঁচশ বছর ধরে চৈতন্যদেব সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কার, দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্ম্য বিশ্বাস ভক্তমনকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই আচ্ছন্নভাব আজও কাটেনি, ফলে –

> "চৈতন্য তিরোভাবের পর মূলত চৈতন্যকে নিয়ে এক দার্শনিক ভক্তিবাদের সৃষ্টি হয়। চৈতন্যচরিত কাব্যগুলি তার ফসল। ভক্ত কবির পুষ্পাঞ্জলি, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ আর নবদ্বীপের নিমাই দুধে আমে এক হয়ে গেল। আর আঁটির মত পড়ে রইল রক্তমাংসের সজীব মানুষটি।"[১৩]

পরিশীলিত যুক্তি, বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'রক্তমাংসের সজীব মানুষ'টির একটি বাস্তব জীবনালেখ্য রচনার চেষ্টা দেখা যায় ড. দীপক চন্দ্রের 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য', পুরাণাশ্রয়ী উপন্যাসটিতে। শ্রী চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের তাগিদে ঔপন্যাসিক একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছেন। Chaitanya and his age, Dr. Dinesh Chandra Sen গ্রন্থে ড. দীনেশচন্দ্র সেন-এর অভিমত এবং ওড়িশি কবি ঈশ্বরদাসের বর্ণিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: মানুষকে আহ্বান করার শক্তির জোরেই নিমাই ভারতকে নাড়া দিয়েছিলেন অন্তরে বাইরে। তবু

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 03*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 16 - 26*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

মানুষের প্রেমের ঠাকুরের কথা শুনল না স্বার্থান্বেষী বিভেদসৃষ্টিকারী পুরোহিত, পাণ্ডা এবং বিশ্বাসঘাতক, ক্ষমতালোভী রাজমাত্যরা। রাজনৈতিক সন্ন্যাসীকে গভীর ষড়যন্ত্রের মূল্য দিতে হল শহীদ হয়ে।

ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত এই উপন্যাসটিতে সেই সময়ের রাজনীতি-সমাজনীতির পাকচক্রে চৈতন্যদেবের অবস্থার বিবরণ আছে - "তৎকালে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের পরমভক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি সর্বদাই বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ও বৈষ্ণব সাধনায় আনুকূল্য করতেন। রাজকার্যে তাঁর মন ছিল না। স্বার্থবিরোধে ও ক্ষমতালোভের চক্রান্তে প্রশাসনের স্বাস্থ্য অনেকদিন থেকে ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হচ্ছিল।" এদিকে চৈতন্য প্রবর্তিত জাতপাতের ঊর্দ্ধে মানবধর্মের প্রভাব পুরীর উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডারা মেনে নিতে পারেনি। চৈতন্যের বিরুদ্ধে তাঁদের অসন্তোষ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এই পুঞ্জীভূত আক্রোশকে কাজে লাগায় সুচতুর সেনাধ্যক্ষ গোবিন্দ বিদ্যাধর। পুরীর ক্ষমতাদখলের লক্ষ্যে প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যের বিরুদ্ধে সুনিপুণ ষড়যন্ত্র রচনা করেন। এবং তাঁর হাতেই চৈতন্যদেবের মৃত্যু হয়। মন্দিরের মধ্যে দেববিগ্রহের প্রকোষ্ঠে জনগণের চোখের আড়ালে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়।

চৈতন্যচরিতকারেরা চৈতন্যের সমকালে জন্মগ্রহণ করেও পরস্পর বিরোধী তথ্য পরিবেশন করেছেন, যুগধর্মের প্রভাব এরজন্য দায়ী। ইতিহাসের নতুন কোনো উপাদানের সন্ধান আর উত্তরকালের অনুসন্ধিৎসু মন, অন্য কোনো নতুন মতের জন্ম দিলেও দিতে পারে। ততদিন পর্যন্ত ধর্মীয় ভাবাবেগের ঊর্দ্ধে উঠে অবতারেরও মৃত্যু হয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য আমাদের মানসিক সংস্কারসাধন ভীষণ জরুরি।

**৪। খেতুরি উৎসব : বৈষ্ণবদের পুনর্জন্ম ও লীলাকীর্তন -**

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) পরবর্তীকালে গোষ্ঠীগত ভাবনা (আলেয়ার সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায়, নিম্বার্ক পন্থা, সাধ্বী সম্প্রদায়, বল্লভী সম্প্রদায় প্রভৃতি) বাংলাদেশের বৈষ্ণব সমাজকে কেন্দ্রচ্যুত করেছিল। ফলে নানাপ্রকার শৈথিল্য ও দুর্বলতা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে সেই সাময়িক নির্জীবতা থেকে বৈষ্ণব ধর্মভাবকে আবার একটি সুসংহত রূপ দেবার চেষ্টা করেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। তিনজন তিনজাতির প্রতিনিধি— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও সদ্‌গোপ। তিনজনের কর্মস্থলও বিভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও বঙ্গ-উড়িষ্যা প্রান্ত। এঁরা তিনজনেই বৃন্দাবনে ষড়গোস্বামী প্রবর্তিত দার্শনিক তত্ত্বচিন্তায় অভিষিক্ত হন। এঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থাদি বাংলাদেশে এসে পৌঁছালে বৈষ্ণবধর্মের পুনর্জাগরণের মনন-বলিষ্ঠ বাতাবরণটি গড়ে ওঠে। বর্তমান আলোচ্য খেতুরি মহোৎসবের হোতা ছিলেন কায়স্থ-জমিদার বংশীয় নরোত্তম (জন্ম আনুমানিক ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ)। রাজশাহি (বর্তমানে বাংলাদেশ) জেলার গড়েরহাট পরগণার একটি সমৃদ্ধ গ্রাম খেতুরি। জমিদার কৃষ্ণদাস নারায়ণীর পুত্র বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম অল্প বয়সেই প্রবল ধর্মানুরাগবশত গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান ও লোকনাথ গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বেশ কিছুকাল পরে শ্রীনিবাসের সঙ্গে স্বভূমিতে ফিরে আসেন এবং পিতৃব্যপুত্র সন্তোষের অনুরোধে ঐখানেই কুটির নির্মাণ করে দিনপাত করতে থাকেন।

নরোত্তম খেতুরিতে নিজ আশ্রমে ছয়টি বিগ্রহ (শ্রী গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও রাধারমণ) স্থাপনের উপলক্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠী নির্বিশেষে সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এই উৎসব খেতুরির মহোৎসব নামে পরিচিত। এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন উক্ত পিতৃব্য পুত্র সন্তোষ। বাংলাদেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বৈষ্ণব মহান্ত ও ছোটোবড়ো ভক্ত সেই উৎসবে সমবেত হয়েছিলেন।

খেতুরির অনুষ্ঠানকাল নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হয়নি। সাধারণ বৈষ্ণবদের মতে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। খেতুরির এই ঐতিহাসিক মহোৎসবের তাৎপর্য বৈষ্ণবসমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বৈষ্ণব মতাদর্শের পুনঃসংস্থাপন বা পরস্পর ভাব বিনিময়ের দ্বারা সংঘশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা ছিল মূল উদ্দেশ্য। নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় পত্নী জাহ্নবা দেবী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে জাহ্নবাদেবীই প্রথম মহিলা মহান্ত, যিনি অন্তঃপুরের বাইরে এসে গোস্বামীদের সম-মর্যাদা লাভ করেন। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি স্থাপনে জাহ্নবাদেবীই প্রথম উদ্যোগ নেন, বৈষ্ণব সমাজে রাধাকৃষ্ণের যুগল চিন্তাজাত উপাসনার ধারা প্রবর্তিত হয়।

সেকালের বহু সম্মানিত বৈষ্ণব মহান্ত এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উড়িষ্যার শ্যামানন্দ, খড়দহের বৃন্দাবন দাস, বলরাম দাস, অম্বিকা কালনা থেকে শ্যামানন্দের গুরু হৃদয়চৈতন্য, নবদ্বীপের শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, শান্তিপুরের অচ্যুতানন্দ ও গোপালদাস, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন এবং লোচনদাস, কাটোয়া থেকে যদুনন্দনদাস প্রমুখের উপস্থিতিই প্রমাণ করে চৈতন্য-পরবর্তী একাধিক বৈষ্ণব গোষ্ঠী পরস্পরের মধ্যে অন্তঃক্ষয়ী দূরত্বমোচনের চেষ্টা হিসেবে খেতুরির মঞ্চকেই বেছে নিয়েছিলেন।

নরোত্তম ঠাকুর পরিকল্পিত পালাবদ্ধ রসকীর্তনের প্রচলন, এই সম্মেলনেই সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী দ্বারা অনুমোদিত হয়। রসকীর্তনের প্রবেশক হিসেবে তদুচিত রসাশ্রিত 'গৌরচন্দ্রিকা'ও প্রবর্তন করেন। নরোত্তম প্রবর্তিত বৈষ্ণব রস-সঙ্গীতের আঙ্গিক রচনার কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মার্দঙ্গিক দেবীদাস ও গৌরাঙ্গদাস। প্রধান দোহার গায়ক ছিলেন শ্রীদাস, গোকুলানন্দ এবং আরও কিছু বিদগ্ধ বৈষ্ণব মহাজন। এই উৎসবে বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের আত্মিক যোগাযোগটি প্রতিষ্ঠা পায়— বৈষ্ণব পদাবলী শুধু কবিতা নয়, তা সংগীতও। পদাবলীর বাঁধুনী দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি গানের জন্যই কল্পিত হয়েছিল। এই খণ্ড কবিতাগুলি সুর ও তালে গীত হলেই তা কীর্তন হয়ে দাঁড়ায়। খেতুরি উৎসব-পূর্বে কীর্তনের প্রচলিত ঘরানা ছিল মান্দারিগী, রেনেটি, মনোহরশাহী। ধ্রুপদ গানের ঠাটে, বিলম্বিত লয়ে নরোত্তমের নব কীর্তনশৈলী গড়েরহাটি বা গরানহাটি নামে পরিচিত হয়। খেতুরি গড়েরহাটি বা গরানহাটি পরগনার অর্ন্তগত বলে এই নামকরণ।

লীলাকীর্তনে রসের বিলাসের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের উপভোগকে ফুটিয়ে তোলা হয়। এজন্যই তা রসকীর্তনও বটে— কীর্তন শুধু গীত নহে, কীর্তন সুরের বিলাসমাত্র নয়, কীর্তনের সুরশিল্প শুধু সঙ্গীতের বিকাশের জন্য কল্পিত হয়। বলা যেতে পারে, কীর্তন— সুর, কাব্য ও ধর্মের ত্রিবেণী। খেতুরি প্রবর্তিত গৌরচন্দ্রিকা ও পালাকীর্তনের চলন ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাড়তে থাকে। তখন গোছানো পালার পুথি প্রয়োজন হয়। ফলে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকটি পদাবলী সংকলন পাওয়া যায়। এই পদাবলী সংকলনগুলি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ পাশাপাশি খেতুরি উৎসবের মাহাত্ম্যও স্বীকার্য।

**৫। ইতিহাসের সন্ধানে: চিত্রচম্পূ ও মহারাষ্ট্রপুরাণ -**

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় বর্গী আক্রমণ একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলাদেশে বর্গীর উৎপাতের সময়সীমা ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলাদেশের মসনদে তখন আলিবর্দী। ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বর্গীদের অত্যাচার বাংলাদেশের জনমানসে এক বিপর্যয়। ভয়াবহ অত্যাচারের কবলে পড়ে গ্রামের পর গ্রাম। বর্গী আক্রমণে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষদের দুর্দশা মুখে মুখে ছড়া-প্রবাদে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ের দুটি কাব্যে বর্গীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী বিধৃত আছে। একটি সংস্কৃত চম্পূকাব্য, পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের চিত্রচম্পূ (১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ), অন্যটি বাংলায় লেখা ঐতিহাসিক কাব্য, গঙ্গারাম সেনের মহারাষ্ট্রপুরাণ (১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ)।

বাণেশ্বর ছিলেন বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের সভাকবি। চিত্রচম্পূ রূপকের আশ্রয়ে রাজা চিত্রসেনের চরিতকাব্য। রাজা চিত্রসেনের স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত এই কাব্যে চিত্রসেনের রাজকীয় দিনযাপনের বিস্তারিত দিনলিপির পাশাপাশি বর্গী আক্রান্ত বঙ্গদেশের প্রত্যক্ষ ইতিহাসও মেলে। অন্যপক্ষে গঙ্গারামের কাব্য পুরাণের আঙ্গিকে মারাঠা বর্গীদের বঙ্গদেশ লুণ্ঠন, আলিবর্দীর পরাভব ও অবশেষে জনসাধারণের বিরোধিতায় বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের পরাভব ও নিধনের অনুপুঙ্ক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়। বাণেশ্বর ও গঙ্গারামের কাব্য দুটির ভাষা, কাহিনি, আঙ্গিক ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বর্গী আক্রমণের বিস্তারিত বর্ণনায় তাঁরা দুজনেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি ছিলেন সমানভাবে দায়বদ্ধ। বর্গী আক্রমণে জর্জরিত সাধারণ মানুষের অসহায়তা ও পলায়নের বিবরণ চিত্রচম্পূ ও মহারাষ্ট্রপুরাণে মোটামুটি একই রকম - "বাগিরা দিনে শতযোজন পথ অতিক্রম করে। যাহাদের অস্ত্র নাই, যাহারা দীন— তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। স্ত্রী বালককেও ছাড়ে না। সমস্ত ধন অপহরণ করে। সাধ্বী স্ত্রীকে লইয়া যায়। আর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চুপিচুপি দেশান্তরে পলাইয়া যায়।"

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত চিত্রচম্পূর অনুবাদ)

অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রপুরাণের বিবরণ এইরকম:

"ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী আছিল।
গোহত্যা স্ত্রী হত্যা শত শত কৈল।।...

সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল।
বরগীর নাম সুইনা সব পলাইল।"

মহারাষ্ট্রপুরাণের তুলনায় চিত্রচম্পূ কাব্যে বর্গী আক্রমণের গদ্য বর্ণনায় সন্ধি সমাসের আড়ম্বর, শ্লোকগুলিতে আলঙ্কারিকতার বাহুল্য আছে। বর্গীসেনাদের আগমন বার্তা শুনে গৌড়বঙ্গের প্রজাপুঞ্জের কাতরোক্তিও যথেষ্ট আলঙ্কারিক - "...প্রকাণ্ড প্রচন্ড বজ্রাভিঘাত খন্ডামান গন্ডশৈল মন্ডল চন্ডরনিতজনিত (...মনে হইল, যেন অকস্মাৎ প্রকান্ড প্রচন্ড বজ্রাঘাতে গন্ডশৈল সকল খন্ডিত হইয়া পড়িতেছে।)" বাণেশ্বরের অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষায় বর্গী আক্রমণের রূঢ় বাস্তবতা খানিকটা হলেও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তুলনায় গঙ্গারামের বর্ণনা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ফলে বাস্তবযোগ্যও -

"ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া যা এ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বেঁধে দেয় তার গলা এ।।
একজনে ছাড়ে আর অন্যজনে ধরে।
রমনের ডরে ত্রাহি শব্দ করে।।"

এই বর্ণনা বাণেশ্বরের মতো কাব্যিক নয়।

> "প্রকৃতপক্ষে 'চিত্রচম্পূ' কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য মহারাষ্ট্রপুরাণের মতো বর্গী আক্রমণের ইতিহাস বর্ণনা নয়, রাজসভার কবিরূপে রাজা চিত্রসেনের প্রশস্তি ও তাঁর রাজস্বপ্নের রূপকার্থ ব্যাখ্যা করা। সুতরাং যে কবি রাজস্বপ্নের বর্ণনাচ্ছলে রাজস্তুতি করতে বসেছেন তাঁর রচনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টি অপেক্ষা রাজমনোরঞ্জন প্রবণতা বেশি কার্যকরী হবে এটাই স্বাভাবিক।"[১৪]

অন্যদিক রাজমনোরঞ্জনের দায় গঙ্গারামের ছিল না।

> "কল্পনার রশ্মি গঙ্গারাম অত্যন্ত সংযত করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে কবিত্বের নিতান্ত অভাব ছিল বলিয়াই নীরস ঐতিহাসিক তথ্যগুলিই তাঁহার রচনায় সহজস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে।"[১৫]

এক নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও সংযত কবিমনের যৌথ ফসল মহারাষ্ট্রপুরাণ। মধ্যযুগের গতানুগতিক আখ্যায়িকাগুলির বিষয় ও আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ইতিহাসাশ্রিত এই কাব্যটি একটি নতুন ধারার দিক্ নির্দেশক। মধ্যযুগ পরবর্তী সাহিত্যধারায় ইতিহাসকে আশ্রয় করে কাব্য, নাটক, উপন্যাস— বিভিন্ন শাখায় ঐতিহাসিক গালগল্পের যে বিস্তার আমরা দেখি গঙ্গারামের তথ্যনিষ্ঠ মহারাষ্ট্রপুরাণই তার ভিত্তি, এতে কোনও দ্বিমত নেই।

**৬। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড়: অস্তিত্বের খোঁজে -**

মধ্যযুগের বিতর্কিত কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের সমঝদার, রাজসভার শোভাবর্ধনের ক্ষেত্রে কুশলী, বহুজ্ঞানী, গুণী শিল্পীর প্রেরণাদাতা। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষত ভারতচন্দ্র ও পরোক্ষে রামপ্রসাদ লাভের পেছনে কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা সদর্থক ও রাজকীয়। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় অন্য এক ব্যক্তিত্ব গোপাল ভাঁড়, এক নিন্দনীয়, ঐতিহাসিক (কিংবা অনৈতিহাসিক?) ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যের আলোচনায় কিছুটা অনভিপ্রেতও বটে। রাজার আত্মীয়স্বজন রাজকর্মচারী ও যোদ্ধৃবর্গদের বাদ দিয়ে ভারতচন্দ্র যেসব গুণীজনকে সভাসদ ও পারিষদরূপে দেখেছিলেন তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ -

"কালীদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ।
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ।।
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন বড় প্রিয়।
মুক্তিরাম মুখুয্যা গোবিন্দ ভক্ত দড়।।
গনক বাড়ুর্য্যা অনুকূল বাচস্পতি।
আর কত গনক গনিতে কি শকতি।।
বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়।
জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধ্যা।।"[১৬]

পারিষদ দলের মধ্যে ভারতচন্দ্র 'গোপালভাঁড়'-এর নাম উল্লেখ করেন নি। ফলে ঐতিহাসিক মহলে গোপালভাঁড়ের অস্তিত্ব নিয়েও নানা প্রশ্ন ওঠে।

পণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃতিচর্চার মূল হোতা হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণচন্দ্র রুচিবাগীশ ছিলেন না। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, এই উচ্চশিক্ষিত কুটরাজনীতি প্রাজ্ঞ-মহিমান্বিত রাজচক্রবর্তী একটি পল্লীগ্রামের সামান্য ব্যক্তির ন্যায় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার কৌতুকরাশিতে সুরুচি কি সংযত ভদ্রতা ছিল না, ... কৌতুকার্থ রাজসভায় তিনটি লোক নিয়োজিত ছিলেন; ১ম গোপাল ভাঁড়, ২য় হাস্যার্ণব উপাধিবিশিষ্ট জনৈক সভাসদ, ৩য় মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ... সুরসিক দেখিয়া রাজা ইঁহাকে বৈবাহিক বলিয়া ডাকিতেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের কৌতুকাভিনয়ে রাজসভায় হাস্য ও বীভৎস রসের শ্রাদ্ধ হইত।

দীনেশচন্দ্র গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। আবার কুমুদনাথ মল্লিক গোপালকে জাতিতে নাপিত (মতান্তরে কায়স্থ) এবং শান্তিপুরের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।

> "তার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, তারমধ্যে অনেকগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন হলেও কতকগুলি গল্পের উৎপত্তি নবাবী আমলে হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। তবে বেশিরভাগ গল্প ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকের গল্প বলে মনে হয়—তখন কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ বয়স।"[১৭]

গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে ঈশ্বরগুপ্তের সরস মন্তব্য—

> "গোপাল ভান্ড কেবল ভান্ডই ছিল, তাহার অপর কোনো কান্ডজ্ঞান ছিল না।"[১৮]

ভারতচন্দ্রের বৃত্তান্তে গোপালের নামোল্লেখ না থাকলেও এই মন্তব্যগুলির ভিত্তিতে তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে দ্বিধামুক্ত হওয়াই সঙ্গত।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে লেখা জীবনীমূলক উপন্যাস, 'মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র'-এ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে গোপাল ভাঁড়ের অবস্থান নির্দিষ্ট করেছেন: হাটে ঘাটে বাজারে গোপাল ভাঁড় অমর। এই সৌখিন যুগেও গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। আকবরের সভায় বীরবল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়। 'বীরবল' এর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আবহমানকাল ধরে রাজারাজড়াদের মনোরঞ্জনে রাজসভার বিদূষকদের কথা মনে আসে। প্রমথ চৌধুরীর বীরবলের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের পেছনে নিহিত কারণ ছিল—

> "(বাবা) একখানি উর্দু বই থেকে আমাদের কেচ্ছা পড়ে শোনাতেন। এর অধিকাংশ কেচ্ছাই এই বলে শুরু হত 'আকবর বীরবলনে পুছা', আর শেষ হত বীরবলের উত্তরে। ... আকবরের প্রশ্নের উত্তরে বীরবলের চোখা চোখা জবাব শুনে আমি মনে মনে তাঁর মহাভক্ত হয়ে উঠলুম। প্রশ্ন করতে পারে সবাই, কিন্তু উত্তর দিতে পারে কজন? আর যে পারে, আমার বালক-বুদ্ধি তাকেই প্রশ্নকর্তার চাইতে উঁচু আসনে বসিয়ে দিলে।"[১৯]

বীরবল প্রসঙ্গে বালক প্রমথর অভিজ্ঞতা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে গোপালভাঁড় সম্পর্কেও সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। গোপালভাঁড়ের প্রচলিত গল্পগুলি আজও নির্মল আনন্দের খোরাক জোগায়। এ কথা সত্যি, গোপালের রসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই অপরিমার্জিত। কিন্তু ভুললে চলবে না, এই সমস্ত রসিকতা সাধারণ মানুষের তরল মন সহজেই গ্রহণ করে। স্থূল রসিকতাগুলি মানুষের অবদমিত কামনা-বাসনা নিবৃত্তির সহায়কও বটে, মনোবিজ্ঞান এর ব্যাখ্যা দেয়। তাই শুধুমাত্র তৎকালীন রাজা-রাজড়ারাই নন, একালেও পথে ঘাটে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে রসিকতার স্তর মাঝে মাঝে এমন নীচে নেমে আসে, যা গোপালকেও লজ্জা দেয়।

রজতকান্ত রায় তাঁর 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ' গ্রন্থে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা নিয়ে গোপালের গল্পগুলিকে 'দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলি নবাবী আমলের শেষ দিকে। আর 'দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলি ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকে দানা বেঁধেছিল। আজু গোঁসাই, গোয়ারি, উলা, গুপ্তিপাড়া ইত্যাদির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থেকে তাই প্রমাণ হয়।' ঈশ্বরগুপ্ত 'লক্ষীকান্ত বিশ্বাস' নামের এক কবিয়ালের সঙ্গে গোপাল ভাঁড়ের তুলনা টেনেছেন—

> "ভাঁড়ামি ব্যাপারে গোপাল ভাঁড় হইতে বড় ন্যূন ছিলেন না।"[২০]

বোঝা যায়, সে সময় গোপাল ছাড়াও আরও অনেকেই এই ভাঁড়ামি ব্যাপারটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই লক্ষীকান্তও উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির স্বক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের সংগ্রহে তাঁর নামোল্লেখ, ও গোপালের সঙ্গে

তুলনায় তাঁকে 'সুগায়ক, সৎকবি এবং সুবক্তা'[২১] হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় গোপালের কৌলিন্য বাড়ে বই কমে না। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ সেন তাঁর 'মহারাজ নন্দকুমার বা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন যে, একশো বছর আগে অনেক স্ত্রীলোক রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কন চন্ডী না শুনে বিদ্যাসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, রসিকরঞ্জন, গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা এইসব পুথি মুখে মুখে শুনতে ভালোবাসত। গল্প শোনার আদি ও অকৃত্রিম আগ্রহ নিরসনে মুখে মুখে প্রচলিত গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলি এক অন্য অভিজ্ঞতা, পাশাপাশি অষ্টাদশ শতকের মানুষের মনের অন্তঃপ্রবাহের সাক্ষ্যপ্রমাণও বটে।

## Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধপ্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, সম্পাদনা সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশালয়, জানুয়ারি, ১৯৯১, কলকাতা -৭০০০০৯, পৃ. ৩৩৬

২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধপ্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, সম্পাদনা সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশালয়, জানুয়ারি, ১৯৯১, কলকাতা -৭০০০০৯, পৃ. ৩৩১

৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধপ্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, সম্পাদনা সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশালয়, জানুয়ারি, ১৯৯১, কলকাতা -৭০০০০৯, পৃ. ৩৩১

৪. চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ৭৯

৫. হালদার, গোপাল, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, আষাঢ়, ১৪০৪, পৃ. ৩৬

৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা- ৯, নভেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ৫০

৭. হালদার, গোপাল, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, আষাঢ়, ১৪০৪, পৃ. ৪২

৮. হালদার, গোপাল, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, আষাঢ়, ১৪০৪, পৃ. ৪২

৯. মিত্র, সনৎকুমার, সাহিত্য টীকা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, ডিসেম্বর, ২০১৪, পৃ. ২৩

১০. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ২৯৮

১১. গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা- ৯, নভেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ১০৭

১২. হালদার, গোপাল, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, আষাঢ়, ১৪০৪, পৃ. ৬৫

১৩. চন্দ্র, ড. দীপক, দৃষ্টিকোণ, সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. vi

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ৯, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ১৬৩

১৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃ. ৯৭৩

১৬. রায়, রজতকান্ত, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, কলকাতা-৭৩, মে, ১৯৬০, পৃ. ৭৯

১৭. রায়, রজতকান্ত, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, কলকাতা-৭৩, মে, ১৯৬০, পৃ. ৮৪

১৮. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, কবিজীবনী, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-২০, মে, ১৯৯৮, পৃ. ৩১৮

১৯. চৌধুরী, প্রমথ, বীরবল, প্রবন্ধ সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা- ৭৩, ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ১৬৮

২০. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, কবিজীবনী, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-২০, মে, ১৯৯৮, পৃ. ৩১৮

২১. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, কবিজীবনী, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-২০, মে, ১৯৯৮, পৃ. ৩১৮